দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩

- English

দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩ সাধারণত পঞ্চাশের মন্বন্তর (বাংলা ১৩৫০ সালে) হিসেবে পরিচিত গুরুতর দুর্যোগ। এতে প্রদেশের প্রায় সাত লক্ষ পরিবারের অথবা ৩৮ লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার লক্ষণীয় অবনতি ঘটে। এর কারণ হলো, তারা তাদের যাবতীয় সম্পত্তি তথা ভূমি, লাঙল, গবাদিপশু, গহনা, বাসন-কোসন, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সামগ্রী বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং এভাবে সাড়ে তিন লক্ষ পরিবার চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালব্যাপী দুর্ভিক্ষে এবং এর ফলে সৃষ্ট মহামারিতে ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক মারা যায়। এ মৃত্যুর হার ছিল স্বাভাবিক মৃত্যুর হারের চেয়ে বেশি। প্রকৃত পক্ষে, এ উপমহাদেশের যে কোনো অংশে ১৭৭০ সালের পর যেসব দুর্ভিক্ষ আঘাত হানে তার মধ্যে এটি ছিল চরমতম।

দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩ [*স্কেচ:* জয়নুল আবেদীন]

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতামত অনুসরণ করে ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে বার্মার পতনের পর থেকে যে সকল কারণ ও ঘটনা পরম্পরা এ দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী তা আলোচনা করা যেতে পারে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ক্রমবর্ধমান খাদ্যশস্যের মূল্য এ সময়ে আরও বেড়ে যায়। এর পিছনে চারটি কারণ ছিল। প্রথমত, প্রদেশে জাপানি আক্রমণ আসন্ন বলে চতুর্দিকে ভীতি ছিল এবং বৃহৎ এলাকাব্যাপী অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। ফলস্বরূপ, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রি করতে সতর্কতা অবলম্বন করে। একই সময়ে বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধির দাবি বাড়তে থাকে; কারণ অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভোক্তাগণ অধিকতর ক্রয় করতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর সরকার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে জনগণকে দুমাসের খাদ্য মজুত রাখতে নির্দেশ দেয়। দ্বিতীয়ত, বার্মা থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে যায় এবং একই সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, যেগুলি বার্মা থেকে আমদানির উপর নির্ভর করত, চালের রপ্তানি বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, জাপানি আক্রমণের ঝুঁকি সামরিক কর্তৃপক্ষকে ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে দুটি ব্যবস্থাসম্বলিত 'প্রত্যাহার' নীতি কার্যকরী করতে বাধ্য করে। একটি ছিল ফসলবছর শেষ হওয়া পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী মেদিনীপুর, বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জেলায় স্থানীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে চাল ও ধান আছে বলে হিসাব করা হয়েছিল তা সরিয়ে নেওয়া। অন্য সিদ্ধান্তটি অনুযায়ী, ১০ জন অথবা তার অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতে সক্ষম এ রকম নৌকা সহজে

আক্রান্ত হতে পারে বিবেচনা করে সমুদ্রতীরবর্তী জেলাসমূহ থেকে সেগুলি প্রত্যাহার করা। চতুর্থত, বার্মার পতন বাংলাকে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে নিয়ে আসে; ফলে প্রদেশে অভূতপূর্ব মাত্রায় সামরিক ও বেসামরিক নির্মাণকাজ শুরু হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এসে পড়ে, কারণ যুদ্ধের খরচ মেটাতে সরকার নোট মুদ্রণের আশ্রয় নেয়।

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে সরকার হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয় এবং জুন মাসে (১৯৪২) কলকাতার বাজারে মোটা ও মাঝারি চালের সংবিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিয়ে আদেশ জারি করে। অনতিবিলম্বে কলকাতা ও অনেকগুলি জেলা থেকে সরবরাহ অদৃশ্য হয়ে যায়। এ সময় 'প্রত্যাহার' নীতি গ্রহণের মাধ্যমে যে মজুত তৈরি হয়, তা অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়। এ মজুতসমূহের একটি অংশ কলকাতায় চালান করা হয় এবং তা বিতরণ করা হয়: (ক) নিয়ন্ত্রিত দোকানের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে, (খ) শিল্প-কারখানার মালিকদের মাধ্যমে, যারা নিজেদের ক্রয় পদ্ধতি ও খাদ্যশস্যের দোকান সংগঠিত করেছিল এবং (গ) কলকাতা পৌরসভার মাধ্যমে। অতি শীঘ্র সংবিধি অনুযায়ী মূল্য সীমা বেঁধে দেয়ার নির্দেশের অকার্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং জেলা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে আপৎকালের সুযোগ নিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে তারা যেন দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার চেষ্টা না করেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞাসহ এ সিদ্ধান্তটি পরিস্থিতির কিছুটা স্বস্তিবিধান করে এবং সরবরাহ ও মূল্য আবার কিছুটা ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসে।

কিন্তু অতি শীঘ্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অক্টোবর মাসে উপকূলীয় জেলাসমূহে ৩২০০ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। যার ফলে ক্ষেতের আমন ধানের বিপুল ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের পর ফসলে রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং এর পরিণতিস্বরূপ ১৯৪২ সালের শেষ দিকে আমন ধানের সংগ্রহে ঘাটতি পড়ে। এর ফলে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে যে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিহত করা হয়েছিল তা আরেকবার নতুন গতি লাভ করে। ২০, ২২ ও ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় বিমানযোগে আক্রমণ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে সঙ্ঘটিত হয় এবং ফলে বেশ কিছু খাদ্যশস্যের দোকান বন্ধ করে দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় সরকার নগরের মজুতসমূহ নিজ দখলে নিয়ে আসার এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত দোকান ও 'অনুমোদিত' বাজারের মাধ্যমে পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। কলকাতায় মজুতসমূহ নিজ দখলে নিয়ে আসতে বাধ্য হবার পর সরকারকে এখন সরবরাহ বজায় রাখতে হয়। সরকার যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছিল, বিমান আক্রমণের পর নতুন করে তার চেয়েও ব্যাপক আকারে সংগ্রহ অভিযান চালু করতে বাধ্য হয়। এ উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে সাতজন এজেন্ট বাছাই করা হয় এবং সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য ধার্য করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর ফলাফল সন্তোষজনক হয় নি; পরিণতিস্বরূপ সংগ্রহ অভিযান পরিত্যক্ত হয় এবং ধান ও চালের নির্ধারিত মূল্যসীমাও তুলে নেওয়া হয়। কলকাতায় তখন সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু একই সময় মূল্যসীমায়ও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কলকাতায় মোটা চালের দাম ১৯৪৩ সালের ৩ মার্চ তারিখের প্রতিমণ ১৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ মে তা প্রায় ৩১ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় প্রতিমণ চাল ৬ টাকার কমে বিক্রি হচ্ছিল। সঙ্কট বিস্তার লাভ করায় কোনো কোনো জেলায় প্রতিমণ চাল ১০০ টাকার উপরে বিক্রি হয়।

চালের এ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য অংশত দায়ী ছিল খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি এবং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মানুষের অন্যান্য কারসাজি। ঘাটতির পিছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হলো নভেম্বর/ ডিসেম্বর মাসে (১৯৪২) আমন ধানের স্বল্প উৎপাদন এবং বার্মা থেকে চাল আমদানি না করা। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের অভিমত ছিল যে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ সালে জের টানা পুরানো চালের মজুতে কমতি ছিল। এ কমিশনের মত অনুযায়ী, প্রায় তিন সপ্তাহের (অর্থাৎ শতকরা প্রায় ছয় ভাগ) প্রয়োজনীয় চালের সরবরাহে ঘাটতি ছিল। তবে ঘাটতি এমন অধিক ছিল না যে, দ্রব্যমূল্যের এতটা ঊর্ধ্বগতি অথবা এ কারণে পরবর্তীসময়ে যে অনাহার ও মৃত্যু ঘটে তাকে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, চালের মূল্যবৃদ্ধি ছিল একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩ [*স্কেচ*: জয়নুল আবেদীন]

প্রকৃতপক্ষে, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শুরু থেকে (১৯৪২ সালে) সরবরাহের অবস্থা চিন্তা করলে মূল্যবৃদ্ধি ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কারণ, বার্মা থেকে আমদানি ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি বাংলার মোট উৎপাদনের বৃহৎ অংশ গঠন করত না। কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মূল্য বৃদ্ধি পায়, কারণ উৎপাদনকারীরা তাদের নিকট থাকা উদ্বৃত্তের পুরোটা পরে অধিক মূল্য পাওয়ার প্রত্যাশায় অথবা ভয়ে বাজারে বিক্রি করতে অনিচ্ছুক ছিল, ভোক্তাগণ তাদের বর্তমান প্রয়োজনের চেয়ে অধিক ক্রয়প্রবণ হয়ে উঠেছিল এবং ব্যবসায়ীরা ফটকামূলক কেনা ও গোপন-মজুতের আশ্রয় নিয়েছিল। পশ্চিমের জেলাসমূহে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়, আমন ধানের নিম্ন ফলন, কলকাতার উপর বিমান আক্রমণ, বার্মা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ঢল, চাল সংগ্রহ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিত্যক্ত হলে উৎপাদনকারী, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের এ ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। লোভ ও ভীতির যে পরিবেশ বিরাজ করছিল তা সমপ্রতিক্রিয়াধারাকে উসকে দেয়। এটি মূল্য-স্তরকে এত উচ্চে নিয়ে যায় যে তা অনুৎপাদনকারী গরিব শ্রেণির বৃহৎ সংখ্যক জনগণ (যাদের মধ্যে কৃষিকার্যে নিয়োজিত শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত) এবং এক শ্রেণির চাষি যারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করত না তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। প্রসঙ্গক্রমে, উনিশ শ ত্রিশের দশকের শেষ দিকে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ চাষি পরিবারপিছু দুই একরের কম পরিমাণ জমির মালিক ছিল এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আট ভাগ ছিল কৃষিকার্যে নিয়োজিত শ্রমিক। অধিকন্তু, বিভিন্ন কারিগরি শিল্প, মাছ ধরা, ধান ভানা এবং অনুরূপ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত লোকজনের বেশ কিছুসংখ্যকও ছিল গরিব। এভাবে, স্বাভাবিক সময়ও গরিব শ্রেণির বেশ কিছু লোক

জীবনধারণের জন্য যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু খেয়েই বেঁচে থাকত, কারণ তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না এবং তাদের যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন তা ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও তারা উপার্জন করত না। তাদের জন্য অনাহার ও জীবনধারণের জন্য নিম্নতম খাদ্যসংগ্রহের মধ্যকার ভারসাম্য এত সূক্ষ্ম ছিল যে মূল্য ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে সামান্য তারতম্য ঘটলে তা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তাদের অনাহার ও মৃত্যু ঘটাতে পারত। এটাই ছিল ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভাগ্যপূর্ণ অবস্থার চিত্র।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যা ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত অনেক বছর যাবৎ মোটামুটিভাবে সঙ্গত বলে বিবেচিত হতো। এরপর অমর্ত্য সেন তাঁর 'বিনিময় অধিকারদান' (exchange entitlement) সম্পর্কিত মতবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে সে ধারণা পাল্টে দেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ সেন যুক্তি দেখান যে, ১৯৪৩ সালে বাংলায় তেমন বড় রকমের খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কারণ, জনগণের একটি বৃহৎ অংশকে বিনিময় অধিকারদানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক অ-কৃষিজীবী শ্রেণি যে মূল্যে তাদের জিনিসপত্র ও শ্রম বিক্রি করেছে তার চেয়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে মনে হয় যে, অমর্ত্য সেনের ও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের বক্তব্যের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। এর কারণ হলো, সেন যেখানে মত পোষণ করেন যে তেমন বড় রকমের খাদ্য ঘাটতি ছিল না, সেখানে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির মতে খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি ছিল শুধুমাত্র শতকরা ছয় ভাগের মতো। এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, সেন যেখানে যুক্তি দেখিয়েছেন যে বিনিময় অধিকারদান একশ্রেণির লোকের ক্ষেত্রে পালিত হয় নি, সেখানে তদন্ত কমিশন দেখিয়েছে যে খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য কৃষিকার্যে নিয়োজিত মজুর ও প্রান্তিক চাষিসহ অধিকতর গরিব শ্রেণির জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল। অর্থাৎ মৌলিক যুক্তি একই রকমের।

১৯৪৩ সালের প্রথম দিকের কয়েক মাসে প্রদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে চরম দুর্দশার রিপোর্ট আসতে থাকে। মে ও জুন মাসে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে দুর্ভিক্ষ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মৃত্যু-হার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায়। জুলাই মাস নাগাদ প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা দুর্ভিক্ষকবলিত হয় এবং মৃত্যুর হার প্রায় সব জেলায় স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ঐ সন্ধিক্ষণ থেকে মৃত্যুর সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতানুযায়ী, গ্রাম্য এলাকাসমূহের দরিদ্রতর শ্রেণিসমূহের ভিতর থেকে প্রায় ষাট লক্ষ (সংখ্যাটি আরও বেশি হতে পারে) লোক আক্রান্ত হয়। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন নিজেদের বাড়িতে থেকে যায়। কিন্তু হাজার হাজার লোক শহর ও নগরে ভিড় করে। অক্টোবর মাসে (১৯৪৩) কলকাতায় তাদের সংখ্যা এক লক্ষের মতো হবে বলে হিসাব করা হয়। কংগ্রেস কর্তৃক ভারত ছাড় আন্দোলন শুরুর পর থেকে প্রদেশে রাজনৈতিক ঘটনাদির সর্বশেষ অবস্থা, সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গভর্নর ও মন্ত্রীদের মধ্যকার বিরোধ, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও কলকাতার প্রয়োজন সম্পর্কে বদ্ধ ধারণা ইত্যাদি ঘটনা সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতিও দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ প্রদানকে অসম্ভব করে তোলে। পরিণতিস্বরূপ, অনাহার ও মৃত্যু ঘটতে থাকে এবং ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। ঐ একই মাসে আমন ধান তোলা হলে ও ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে সরবরাহ পৌঁছলে চালের মূল্য বেশ কিছুটা নিচে নেমে আসে এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমে যায়। কিন্তু ১৯৪৪ সালের পুরো সময়ব্যাপী মৃত্যুর হার উচ্চই থেকে যায়। এর কারণ ছিল কলেরা, বসন্ত-রোগ ও ম্যালেরিয়া মহামারির প্রার্দুভাব। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালব্যাপী ক্ষুধা, অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রোগভোগ চলতে থাকে, তবে অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত মাত্রায়।

দুর্ভিক্ষের তীব্রতর অবস্থা চলতে থাকার সময় জনতার প্রচন্ড দাবির মুখে ভারতীয় সরকার কর্তৃক দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিটিকে ভারতে, এবং বিশেষভাবে বাংলায়, খাদ্য ঘাটতি ও পরবর্তী সময়ে মহামারির কারণ অনুসন্ধান করতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর যাতে সংঘটিত না হয় সেজন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরি করতে বলা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার জন উডহেড এবং এর সদস্যবৃন্দ ছিলেন এস.ভি রামমূর্তি, মনিলাল নানাবতী, এম. আফজাল হুসাইন ও ডব্লিউ.আর এক্রয়েড। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কমিশন দিল্লিতে মিলিত হয় এবং এরপর বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখে। বাংলায় অবস্থানকালে কমিশন রুদ্ধদ্বার কক্ষে ১৩০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য শোনে। কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট তিন অংশে বিভক্ত ছিল যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল সর্বমোট ১৯টি অধ্যায় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ আটটি পরিশিষ্ট। খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ ও বিদ্যমান সরবরাহের বণ্টনের মতো বিষয়াদি নিয়ে কমিশনের অভ্যন্তরে বেশ কিছু মতভেদ ছিল এবং এর অন্যতম সদস্য এম. আফজাল হুসাইন পৃথক একটি বিবরণ দাখিল করেন। কমিশন তার সংগৃহীত প্রামাণিক সাক্ষ্যের ছয় খন্ড প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং একজন কমিশনার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রামাণিক সাক্ষ্যের প্রতিলিপি ধ্বংসসাধনের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ তোলেন। উপরে বর্ণিত যে প্রথায় দুর্ভিক্ষের কারণসমূহ শনাক্তকরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে সেখানে কমিশন বাংলার মন্ত্রিবর্গ ও খাদ্য বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলাদের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহের পুরো ধারাবাহিকতাকে অবস্থার ক্রমাবনতির জন্য দোষারোপ করেছে। [এম মোফাখখারুল ইসলাম]

'http://bn.banglapedia.org/index.php?title=দুর্ভিক্ষ,_১৯৪৩&oldid=17043' থেকে আনীত

- এ পাতায় শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১২:৩৮টার সময়, ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে।

- এ পাতাটি ১৬,৭০০ বার দেখা হয়েছে।